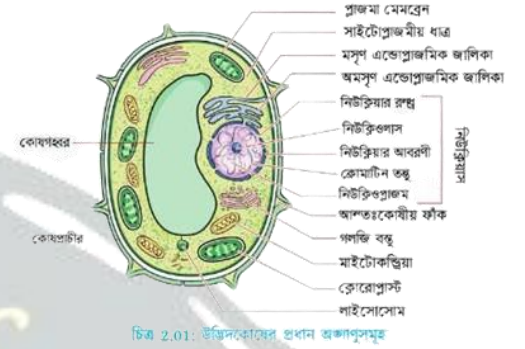


## জীবকোষ

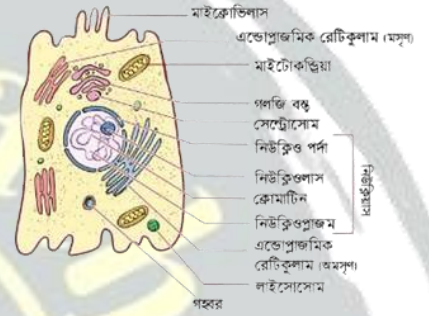
- জীবকোষ হচ্ছে জীবদেহের একক।
- জীবদেহের গঠন ও জীবজ ক্রিয়াকলাপের একক।
- লোয়ি এবং সিকেভিজ 1969 সালে বৈষম্য ভেদ্য পর্দা দিয়ে আবৃত এবং জীবজ ক্রিয়াকলাপের একক যা অন্য সজীব মাধ্যম ছাড়াই নিজের প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে, এমন সত্তাকে কোষ বলেছেন।

## কোষের প্রকারভেদ

- নিউক্লিয়াসের গঠনের ভিত্তিতে কোষ দুই ধরনের, **আদি কোষ** এবং **প্রকৃত কোষ**।



চিত্র 2.01: উদ্ভিদকোষের প্রধান অঙ্গাণুসমূহ



চিত্র 2.02: প্রাণিকোষের প্রধান অঙ্গাণুসমূহ

আদিকোষ বা প্রাককেন্দ্রিক কোষ (Prokaryotic cell)	প্রকৃত কোষ বা সুকেন্দ্রিক কোষ (Eukaryotic cell)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• এ ধরনের কোষে কোনো সুগঠিত <b>নিউক্লিয়াস</b> থাকে না। এজন্য এদের আদি নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষও বলা হয়।</li> <li>• এসব কোষের নিউক্লিয়াস কোনো পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে না, তাই নিউক্লিও-বস্তু সাইটোপ্লাজমে ছড়ানো থাকে।</li> <li>• এসব কোষে মাইটোকন্ড্রিয়া, প্লাস্টিড, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ইত্যাদি <b>অঙ্গাণু</b> থাকে না তবে রাইবোজোম থাকে।</li> <li>• ক্রোমোজোমে কেবল DNA থাকে।</li> <li>• <b>নীলাভ সবুজ শৈবাল</b> বা <b>ব্যাকটেরিয়া</b> এ ধরনের কোষ পাওয়া যায়।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• এসব কোষের নিউক্লিয়াস সুগঠিত অর্থাৎ নিউক্লিয়ার ঝিল্লি (nuclear membrane) দিয়ে নিউক্লিও-বস্তু পরিবেষ্টিত ও সুসংগঠিত।</li> <li>• এসব কোষে <b>রাইবোজোমসহ সকল অঙ্গাণু</b> উপস্থিত থাকে।</li> <li>• ক্রোমোজোমে DNA, প্রোটিন, হিস্টোন এবং অন্যান্য উপাদান থাকে।</li> <li>• <b>অধিকাংশ জীবকোষ</b> এ ধরনের হয়।</li> </ul>

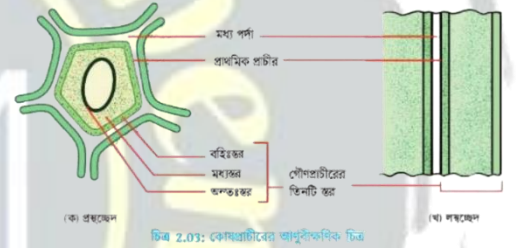
- কাজের ভিত্তিতে প্রকৃত কোষ দুই ধরনের, দেহকোষ এবং জনকোষ।

দেহকোষ	জনকোষ
<ul style="list-style-type: none"> <li>• বহুকোষী জীবের দেহ গঠনে এসব কোষ অংশগ্রহণ করে।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• যৌন প্রজনন ও জনুঃক্রম দেখা যায়, এমন জীবে জনকোষ উৎপন্ন হয়।</li> </ul>

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভাজনের মাধ্যমে দেহকোষ বিভাজিত হয় এবং এভাবে দেহের বৃদ্ধি ঘটে।</li> <li>• বিভিন্ন তন্ত্র ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠনে দেহকোষ অংশ নেয়।</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• মিয়োসিস পদ্ধতিতে জনন মাতৃকোষের বিভাজন ঘটে এবং জনন কোষ উৎপন্ন হয়।</li> <li>• অপত্য জননকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃজনন কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক থাকে।</li> <li>• পুং ও স্ত্রী জননকোষ মিলিত হয়ে নতুন জীবের দেহ গঠনের সূচনা করে। পুং ও স্ত্রী জননকোষের মিলনের ফলে সৃষ্ট এই প্রথম কোষটিকে জাইগোট (Zygote) বলে।</li> <li>• জাইগোট বারবার বিভাজনের মাধ্যমে জীবদেহ গঠন করে।</li> </ul> |
|--|--|

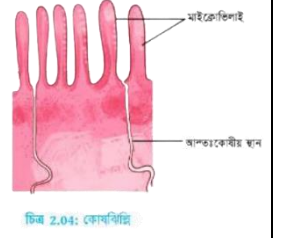
## কোষের খুঁটিনাটি

<p><b>কোষপ্রাচীর</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• কোষপ্রাচীর <b>উদ্ভিদ কোষের</b> একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। প্রাণিকোষে কোষপ্রাচীর থাকে না।</li> <li>• এটি <b>মৃত বা জড়বস্তু</b> দিয়ে তৈরি।</li> <li>• কোষপ্রাচীরের রাসায়নিক গঠন বেশ জটিল, এতে <b>সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ, লিগনিন, পেকটিন, সুবেরিন</b> নামক রাসায়নিক পদার্থ থাকে।</li> <li>• তবে ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীর প্রোটিন, লিপিড ও পলিস্যাকারাইড দিয়ে এবং ছত্রাকের কোষপ্রাচীর কাইটিন দিয়ে তৈরি।</li> <li>• মধ্য পর্দার উপর প্রোটোপ্লাজম থেকে নিঃসৃত কয়েক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য জমা হয়ে প্রথমে এক স্তরবিশিষ্ট প্রাথমিক প্রাচীর ও পরবর্তীতে গৌণপ্রাচীর সৃষ্টি হয়।</li> <li>• এ প্রাচীরে মাঝে মাঝে ছিদ্র থাকে, যাকে <b>কূপ</b> বলে।</li> <li>• কোষপ্রাচীর কোষকে দৃঢ়তা প্রদান করে, কোষের আকার ও আকৃতি বজায় রাখে। পাশের কোষের সাথে <b>প্লাজমোডেজমাটা (আণুবীক্ষণিক নালি)</b> সৃষ্টির মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং পানি ও খনিজ লবণ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।</li> </ul>
<p><b>প্রোটোপ্লাজম</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• কোষের ভিতরে যে অর্ধস্বচ্ছ, থকথকে জেলির মতো বস্তু থাকে তাকে প্রোটোপ্লাজম বলে।</li> <li>• কোষঝিল্লি দিয়ে ঘেরা সবকিছুই প্রোটোপ্লাজম, এমনকি কোষঝিল্লি নিজেও প্রোটোপ্লাজমের অংশ।</li> <li>• কোষঝিল্লী ছাড়াও এখানে আছে সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণুগুলো এবং নিউক্লিয়াস।</li> </ul>



## কোষঝিল্লি

- প্রোটোপ্লাজমের বাইরে দুই স্তরের যে স্থিতিস্থাপক পর্দা থাকে, তাকে কোষঝিল্লি বা প্লাজমালেমা বা প্লাজমা মেমব্রেন বলে।
- কোষঝিল্লির ভাঁজকে **মাইক্রোভিলাই** বলে।
- এটি প্রধানত **লিপিড** এবং **প্রোটিন** দিয়ে তৈরি।
- কোষঝিল্লি একটি বৈষম্যভেদ্য পর্দা হওয়ায় অভিস্রবণের মাধ্যমে পানি ও খনিজ লবণ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে এবং পাশাপাশি কোষগুলোকে পরস্পর থেকে আলাদা করে রাখে।



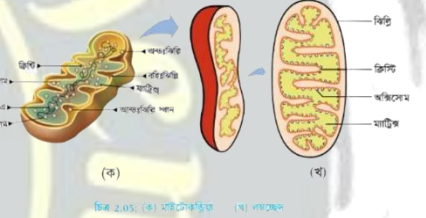
## সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু

- প্রোটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিকাটিকে সরিয়ে দিলে যে জেলির মতো বস্তুটি থেকে যায় সেটিই সাইটোপ্লাজম। এই সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অনেক ধরনের অঙ্গাণু থাকে। এদের প্রত্যেকের কাজ আলাদা হলেও একে অপরের উপর নির্ভরশীল। এই অঙ্গাণুগুলোর কোনো কোনোটি ঝিল্লিযুক্ত আবার কোনো কোনোটি ঝিল্লিবিহীন।

## ঝিল্লিবদ্ধ সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু

## মাইটোকন্ড্রিয়া

- এ অঙ্গাণুটি আবিষ্কার করেন **রিচার্ড অল্টম্যান** এবং এর নাম দেন **‘বায়োপ্লাস্ট’**,
- তবে বর্তমানে প্রচলিত নামটি দেন বিজ্ঞানী **বেনডা**।
- এটি দুই স্তরবিশিষ্ট আবরণী বা ঝিল্লি দিয়ে ঘেরা। ভিতরের স্তরটি ভিতরের দিকে আসুলের মতো ভাঁজ হয়ে থাকে। এদের **ক্রিস্টি** (cristae) বলে।
- ক্রিস্টির গায়ে বৃত্তাকার গোলাকার বস্তু থাকে, এদের **অক্সিজোম** (oxisomes) বলে। অক্সিজোমে উৎসেচকগুলো (enzymes) সাজানো থাকে।
- মাইটোকন্ড্রিয়নের (এক বচন) ভিতরে থাকে ম্যাট্রিক্স (matrix)।
- জীবের শ্বসনকার্যে** সাহায্য করা মাইটোকন্ড্রিয়ার প্রধান কাজ। শ্বসন ক্রিয়ার ধাপ চারটি: গ্লাইকোলাইসিস, অ্যাসিটাইল কো-এ সৃষ্টি, ক্রেবস চক্র এবং ইলেকট্রন প্রবাহ তন্ত্র। এর প্রথম ধাপ (গ্লাইকোলাইসিসের বিক্রিয়াগুলো) মাইটোকন্ড্রিয়ায় ঘটে না। তবে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপ মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যেই সম্পন্ন হয়।
- শ্বসনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ক্রেবস চক্রে (তৃতীয় ধাপে) অংশগ্রহণকারী সব উৎসেচক উপস্থিত থাকায় এ বিক্রিয়াগুলো মাইটোকন্ড্রিয়াতেই সম্পন্ন হয়।
- ক্রেবস চক্রে সবচেয়ে বেশি শক্তি** উৎপাদিত হয়। এজন্য মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের **‘শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র’** বা **‘পাওয়ার হাউস’** বলা হয়। জীব তার বিভিন্ন কাজে এই শক্তি খরচ করে।
- কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সকল উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষে মাইটোকন্ড্রিয়া পাওয়া যায়।

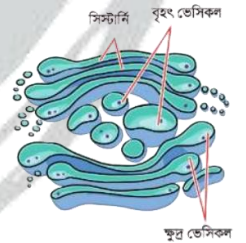




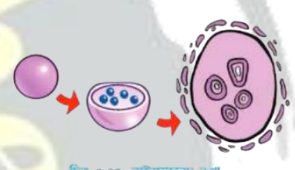
	<ul style="list-style-type: none"> <li>প্রাকেন্দ্রিক কোষে মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে না। এমনকি কিছু সুকেন্দ্রিক কোষও (যেমন: <i>Trichomonas</i>, <i>Monocercomonoides</i> ইত্যাদি <b>প্রোটোজোয়াতে</b>) মাইটোকন্ড্রিয়া অনুপস্থিত।</li> </ul>
প্লাস্টিড	<ul style="list-style-type: none"> <li>বিজ্ঞানী <b>আর্নস্ট হেকেল</b> উদ্ভিদ কোষের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণু প্লাস্টিড আবিষ্কার করেন।</li> <li>প্লাস্টিডের প্রধান কাজ খাদ্য প্রস্তুত করা, খাদ্য সঞ্চয় করা এবং উদ্ভিদদেহকে বর্ণময় এবং আকর্ষণীয় করে পরাগায়নে সাহায্য করা।</li> <li>প্লাস্টিড তিন ধরনের— ক্লোরোপ্লাস্ট, ক্রোমোপ্লাস্ট এবং লিউকোপ্লাস্ট।</li> <li><b>ক্লোরোপ্লাস্ট (Chloroplast):</b> সবুজ রঙের প্লাস্টিডকে ক্লোরোপ্লাস্ট বলে। পাতা, কচি কাণ্ড ও অন্যান্য সবুজ অংশে এদের পাওয়া যায়। প্লাস্টিডের গ্রানা (grana) অংশ সূর্যালোককে আবদ্ধ করে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। এই আবদ্ধ সৌরশক্তি স্ট্রোমাতে (stroma) অবস্থিত উৎসেচক সমষ্টি, বায়ু থেকে গৃহীত কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং কোষের ভিতরকার পানি ব্যবহার করে <b>সবল শর্করা তৈরি</b> করে। এই প্লাস্টিডে <b>ক্লোরোফিল</b> থাকে, তাই এদের সবুজ দেখায়। এছাড়া এতে ক্যারোটিনয়েড নামে এক ধরনের রঞ্জকও থাকে।</li> <li><b>ক্রোমোপ্লাস্ট (Chromoplast):</b> এগুলো রঙিন প্লাস্টিড তবে সবুজ নয়। এসব <b>প্লাস্টিডে জ্যান্থফিল (হলুদ), ক্যারোটিন (কমলা), ফাইকোএরিথ্রিন (লাল), ফাইকোসায়ানিন (নীল)</b> ইত্যাদি রঞ্জক থাকে। এদের মিশ্রণজনিত কারণে ফুল, পাতা এবং উদ্ভিদের অন্যান্য অংশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। <b>রঙিন ফুল, পাতা এবং গাজরের মূলে</b> এদের পাওয়া যায়। ফুলকে আকর্ষণীয় করে <b>পরাগায়নে সাহায্য</b> করা এদের প্রধান কাজ। এরা বিভিন্ন ধরনের রঞ্জক পদার্থ সংশ্লেষণ করে জমা করে রাখে।</li> <li><b>(iii) লিউকোপ্লাস্ট (Leucoplast):</b> যেসব প্লাস্টিডে কোনো রঞ্জক পদার্থ থাকে না, তাদের লিউকোপ্লাস্ট বলে। যেসব কোষে সূর্যের আলো পৌঁছায় না, (যেমন: <b>মূল, ভ্রূণ, জননকোষ</b> ইত্যাদি) সেখানে এদের পাওয়া যায়। এদের প্রধান কাজ <b>খাদ্য সঞ্চয়</b> করা। আলোর সংস্পর্শে এলে লিউকোপ্লাস্ট ক্লোরোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হতে পারে।</li> </ul>
গলজি বস্তু	<ul style="list-style-type: none"> <li>গলজি বস্তু (কিংবা গলগি বস্তু) প্রধানত প্রাণিকোষে পাওয়া যায়, তবে অনেক উদ্ভিদকোষেও এদের দেখা যায়।</li> <li>এটি সিস্টার্নি ও কয়েক ধরনের ভেসিকল নিয়ে তৈরি।</li> <li>এর পর্দায় বিভিন্ন উৎসেচকের পানি বিয়োজন সম্পন্ন হয়। জীবকোষে বিভিন্ন <b>পদার্থ নিঃসৃতকরণের</b> সাথে এর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। হরমোন নিঃসরণেও এর ভূমিকা লক্ষ করা যায়।</li> <li>কোনো কোনো বিপাকীয় কাজের সাথেও এরা সম্পর্কিত এবং কখনো কখনো এরা প্রোটিন সঞ্চয় করে রাখে।</li> </ul>
এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম	<ul style="list-style-type: none"> <li>এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম-এর আবরণীর গায়ে প্রায়ই <b>রাইবোজোম</b> লেগে থাকে, তাই স্বাভাবিকভাবেই এসব স্থানে <b>প্রোটিন সংশ্লেষণের ঘটনা</b> ঘটে।</li> </ul>



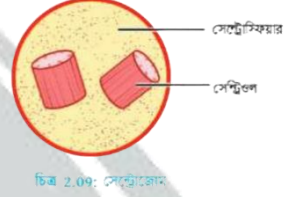
চিত্র 2.06: একটি ক্লোরোপ্লাস্টের (খনিজ) : ক্লোরোপ্লাস্টের বিভিন্ন অংশ (উৎসেচক অণুসহকারে) : পানি, আলো এবং মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে প্রাপ্ত শক্তি।



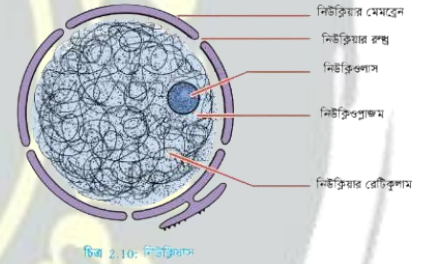
চিত্র 2.07: গলজি বস্তু

	<ul style="list-style-type: none"> <li>কোষে উৎপাদিত পদার্থগুলোর <b>প্রবাহ পথ</b> হিসেবে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ব্যবহৃত হয়।</li> <li>এগুলো কখনো কখনো প্লাজমা মেমব্রেনের সাথে যুক্ত থাকে। তাই ধারণা করা হয় যে, এক কোষ থেকে অন্য কোষে উৎসেচক ও কোষে উৎপাদিত অন্যান্য দ্রবাদি এর মাধ্যমে চলাচল করে।</li> <li><b>মাইটোকন্ড্রিয়া</b>, <b>কোষগহ্বর</b> এগুলো সৃষ্টিতে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয় কোষেই এরা উপস্থিত থাকে।</li> </ul>
<b>কোষগহ্বর</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>সাইটোপ্লাজমে কোষের মধ্যে যে আপাত ফাঁকা স্থান দেখা যায়, সেগুলোই হচ্ছে কোষগহ্বর।</li> <li>বৃহৎ কোষগহ্বর উদ্ভিদ কোষের বৈশিষ্ট্য।</li> <li>এর প্রধান কাজ <b>কোষরস ধারণ</b> করা। বিভিন্ন ধরনের <b>অজৈব লবণ</b>, <b>আমিষ</b>, <b>শর্করা</b>, <b>চর্বিজাতীয় পদার্থ</b>, <b>জৈব এসিড</b>, <b>রঞ্জক পদার্থ</b>, <b>পানি</b> ইত্যাদি এই কোষরসে থাকে।</li> <li><b>প্রাণিকোষে</b> কোষগহ্বর সাধারণত <b>অনুপস্থিত</b> থাকে, তবে যদি কখনো থাকে, তবে সেগুলো আকারে ছোট হয়।</li> </ul>
<b>লাইসোজোম</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>লাইসোজোম জীবকোষকে জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করে।</li> <li>এর উৎসেচক আগত <b>জীবাণুগুলোকে হজম করে</b> ফেলে।</li> <li>এর পরিপাক করার উৎসেচকগুলো একটি পর্দা দিয়ে আলাদা করা থাকে, তাই অন্যান্য অঙ্গাণু এর সংস্পর্শে এলেও হজম হয় না।</li> <li>দেহে অক্সিজেনের অভাব হলে বা বিভিন্ন কারণে লাইসোজোমের পর্দা ক্ষতিগ্রস্ত হলে এর আশপাশের অঙ্গগুলো নষ্ট হয়ে যায়। কখনো কখনো <b>কোষটিই মারা যায়</b>।</li> </ul> 
<b>ঝিল্লিবিহীন সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু</b>	
<b>কোষকঙ্কাল</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>কোষঝিল্লি অতিক্রম করে কোষের ভিতরে ঢুকলে প্রথমেই কোষকঙ্কাল নজরে পড়বে।</li> <li>সেটি লম্বা এবং মোটা-চিকন মিলিয়ে অসংখ্য দড়ির মতো বস্তু যা কোষের চারদিকে জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে।</li> <li>কোষকঙ্কাল ভিতর থেকে <b>কোষটিকে ধরে রাখে</b>।</li> <li><b>অ্যাকটিন</b>, <b>মায়োসিন</b>, <b>টিউবিউলিন</b> ইত্যাদি প্রোটিন দিয়ে কোষকঙ্কালের বিভিন্ন ধরনের তন্তু নির্মিত হয়।</li> <li><b>মাইক্রোটিউবিউল</b>, <b>মাইক্রোফিলামেন্ট</b> কিংবা <b>ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট</b> এ ধরনের তন্তুর উদাহরণ।</li> </ul>
<b>রাইবোজোম</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>প্রাণী এবং উদ্ভিদ উভয় ধরনের কোষেই এদের পাওয়া যায়।</li> <li>এই ঝিল্লিবিহীন বা পর্দাবিহীন অঙ্গাণুটি প্রধানত <b>প্রোটিন সংশ্লেষণে</b> সাহায্য করে। প্রোটিনের পলিপেপটাইড চেইন সংযোজন এই রাইবোজোমে হয়ে থাকে।</li> <li>এছাড়া রাইবোজোম এ কাজে প্রয়োজনীয় <b>উৎসেচক সরবরাহ</b> করে থাকে। (উৎসেচক বা এনজাইমের কাজ হলো প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি বাড়িয়ে দেওয়া।)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>উল্লেখ্য, মাইটোকন্ড্রিয়ার ম্যাট্রিক্স এবং গ্লাস্টিডের স্ট্রোমাতেও রাইবোজোম থাকে, যেগুলো ঐ অঙ্গাণুসমূহের নিজস্ব ডিএনএ-এর সংকেত অনুযায়ী প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশ নেয়, ঠিক যেমন একটি ব্যাকটেরিয়া কোষের সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত রাইবোজোম সেই কোষের জন্য প্রোটিন সংশ্লেষণ করে। (জৈব অভিব্যক্তির ধারায় অন্য কোষের অংশ হয়ে ওঠার আগে এই দুটি অঙ্গাণু যে একসময় স্বাধীনভাবে বসবাস করতো।)</li> </ul>
সেন্ট্রোজোম	<ul style="list-style-type: none"> <li>এটি <b>প্রাণিকোষের</b> বৈশিষ্ট্য, প্রধানত প্রাণিকোষে এদের পাওয়া যায়। নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদ কোষে কদাচিৎ এদের দেখা যায়।</li> <li>প্রাণিকোষের নিউক্লিয়াসের কাছে দুটি ফাঁপা নলাকার বা দণ্ডাকার অঙ্গাণু দেখা যায়, তাদের <b>সেন্ট্রিওল</b> বলে।</li> <li>সেন্ট্রিওলের চারপাশে অবস্থিত গাঢ় তরলকে <b>সেন্ট্রোস্ফিয়ার</b> এবং <b>সেন্ট্রোস্ফিয়ারসহ সেন্ট্রিওলকে সেন্ট্রোজোম বলে।</b></li> <li>সেন্ট্রোজোমে থাকা সেন্ট্রিওল কোষ বিভাজনের সময় <b>অ্যাস্টার রে</b> তৈরি করে। এছাড়া স্পিন্ডল যন্ত্র সৃষ্টিতেও সেন্ট্রোজোমের অবদান রয়েছে।</li> <li>বিভিন্ন ধরনের <b>ফ্লাজেলা সৃষ্টিতে</b> এরা অংশগ্রহণ করে।</li> </ul>

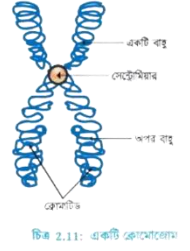


নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিকা	<ul style="list-style-type: none"> <li>জীবকোষের প্রোটোপ্লাজমে নির্দিষ্ট পর্দাঘেরা ক্রোমোজোম বহনকারী সুস্পষ্ট যে বস্তুটি দেখা যায় সেটিই হচ্ছে নিউক্লিয়াস।</li> <li>এর আকৃতি গোলাকার, ডিম্বাকার বা নলাকার। <b>সিভকোষ এবং লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না।</b></li> <li>নিউক্লিয়াসে বংশগতির বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে। এটি কোষে সংঘটিত বিপাকীয় কার্যাবলিসহ সব ক্রিয়া-বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। সুগঠিত নিউক্লিয়াসে নিচের অংশগুলো দেখা যায়।</li> <li><b>নিউক্লিয়ার ঝিল্লি:</b> নিউক্লিয়াসকে ঘিরে রাখে যে ঝিল্লি, তাকে নিউক্লিয়ার ঝিল্লি বা কেন্দ্রিকা ঝিল্লি বলে। এটি দুই স্তর বিশিষ্ট। এই ঝিল্লি <b>লিপিড ও প্রোটিনের</b> সমন্বয়ে তৈরি হয়। এই ঝিল্লিতে মাঝে মাঝে কিছু ছিদ্র থাকে, যেগুলোকে <b>নিউক্লিয়ার রন্ধ্র</b> বলে। এই ছিদ্রের ভিতর দিয়ে নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজমের মধ্যে কিছু বস্তু চলাচল করে। <b>নিউক্লিয়ার ঝিল্লি সাইটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয়াসের অন্যান্য বস্তুকে পৃথক রাখে এবং বিভিন্ন বস্তুর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।</b></li> <li><b>নিউক্লিওপ্লাজম:</b> নিউক্লিয়ার ঝিল্লির ভিতরে জেলির মতো বস্তু বা রস থাকে। একে কেন্দ্রিকারস বা নিউক্লিওপ্লাজম বলে। নিউক্লিওপ্লাজমে <b>নিউক্লিক এসিড, প্রোটিন, উৎসেচক ও কতিপয় খনিজ লবণ</b> থাকে।</li> </ul>
---------------------------	--





- **নিউক্লিওলাস:** নিউক্লিওলাজের মধ্যে ক্রোমোজোমের সাথে সংলগ্ন গোলাকার বস্তুকে নিউক্লিওলাস বা কেন্দ্রিকাণু বলে। ক্রোমোজোমের রংঅগ্রাহী অংশের সাথে এরা লেগে থাকে। এরা **RNA ও প্রোটিন** দিয়ে তৈরি হয়। এরা **রাইবোজোম সংশ্লেষণ** করে।
- **ক্রোমাটিন জালিকা:** বিভাজন চলছে না, এমন কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে সুতার মতো জিনিস জট পাকিয়ে থাকতে দেখা যায়। এই সুতাগুলো হলো ক্রোমাটিন। *ক্রোমাটিন (তথা ক্রোমোজোম) মূলত DNA এবং প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত জটিল কাঠামো, যা জেনেটিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বংশপরাম্পরায় সঞ্চারিত হওয়ার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।* জট পাকিয়ে থাকা সেই আলাদা তন্তুগুলোকে একসাথে ক্রোমাটিন জালিকা বা নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম বলা হয়। কোষ বিভাজনের সময় সেই জট কিছুটা খুলে যায় এবং ক্রোমাটিনগুলো তখন আরো মোটা এবং খাটো হয়। সুকেন্দ্রিক কোষের ক্রোমাটিনগুলোকে তখন আলাদা আলাদা কাঠামো হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। কোষবিভাজনের সময় মোটা ও খাটো হয়ে আলাদা হয়ে পড়া ক্রোমাটিনগুলোর আরেক নাম **ক্রোমোজোম**। বিভাজনের **মেটাফেজ দশায়** তা সবচেয়ে ভালো বোঝা যায়। মেটাফেজ দশায় প্রতিটি ক্রোমোজোম বিভাজিত হয়ে ক্রোমোজোমজোড় গঠন করে যার দৈর্ঘ্য বরাবর অর্ধাংশকে বলে এক একটি **ক্রোমাটিড**। ক্রোমাটিডের (প্রায়) মধ্যবর্তী অংশে একটি সংকুচিত অঞ্চল থাকে যার নাম **সেন্ট্রোমিয়ার**। কোষ বিভাজনের সময় সেন্ট্রোমিয়ারের যে অংশে স্পিন্ডল ফাইবার মাইক্রোটিউবিউল এসে যুক্ত হয় তাকে বলে **কাইনেটোকোর**। সেন্ট্রোমিয়ারের উভয় পাশে ক্রোমাটিডের অংশদুটি হল তার দুটি **বাহু (arm)**। **এনাফেজ দশায়** যখন সেন্ট্রোমিয়ার বরাবর ক্রোমাটিড জোড়া বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন প্রতিটি ক্রোমাটিডকেই এক একটি ক্রোমোজোম হিসেবে ধরা হয়।





## উদ্ভিদ টিস্যু

- একই বা বিভিন্ন প্রকারের একগুচ্ছ কোষ একত্রিত হয়ে যদি একই কাজ করে এবং তাদের উৎপত্তিও যদি অভিন্ন হয়, তখন তাদের টিস্যু বা কলা বলে।
- টিস্যু দুই ধরনের, **ভাজক টিস্যু** এবং **স্থায়ী টিস্যু**।
- ভাজক টিস্যুর কোষগুলো বিভাজনে সক্ষম কিন্তু স্থায়ী টিস্যুর কোষগুলো বিভাজিত হতে পারে না।
- স্থায়ী টিস্যু তিন ধরনের, যথা- **সরল টিস্যু**, **জটিল টিস্যু** এবং **নিঃস্রাবী (ক্ষরণকারী) টিস্যু**।

## সরল টিস্যু

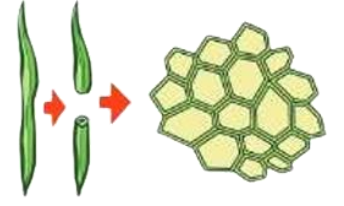
- যে স্থায়ী টিস্যুর প্রতিটি কোষ আকার, আকৃতি ও গঠনের দিক থেকে অভিন্ন, তাকে সরল টিস্যু বলে। কোষের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে সরল টিস্যুকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- **প্যারেনকাইমা**, **কোলেনকাইমা** এবং **স্ক্লেরেনকাইমা**।

<p><b>প্যারেনকাইমা</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• এ টিস্যুর কোষগুলো <b>জীবিত</b>, সমব্যাসীয়, পাতলা প্রাচীরযুক্ত এবং প্রোটোপ্লাজম দিয়ে পূর্ণ।</li> <li>• এই টিস্যুতে আন্তঃকোষীয় ফাঁক দেখা যায়।</li> <li>• কোষপ্রাচীর পাতলা এবং সেলুলোজ দিয়ে তৈরি হয়।</li> <li>• এসব কোষে যখন ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে, তখন তাকে <b>ক্লোরেনকাইমা</b> বলে।</li> <li>• জলজ উদ্ভিদের বড় বড় বায়ু-কুঠুরিযুক্ত প্যারেনকাইমাকে <b>অ্যারেনকাইমা</b> বলে।</li> <li>• প্যারেনকাইমা টিস্যুর প্রধান কাজ দেহ গঠন করা, খাদ্য প্রস্তুত করা, খাদ্য সঞ্চয় করা এবং খাদ্যদ্রব্য পরিবহণ করা।</li> </ul> 
<p><b>কোলেনকাইমা</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• কোষপ্রাচীরে সেলুলোজ এবং পেকটিন জমা হয়ে পুরু হয় এবং কোণগুলোকে পার্শ্বের প্রাচীরের তুলনায় অধিক মোটা দেখায়।</li> <li>• তবে এদের কোষপ্রাচীর অসমভাবে পুরু এবং কোণগুলো পেকটিন জমা হওয়ার কারণে অধিক পুরু হয়।</li> <li>• এ টিস্যুর কোষগুলো লম্বাটে ও <b>সজীব</b>। এরা প্রোটোপ্লাজমপূর্ণ কোষ দিয়ে তৈরি হয়।</li> <li>• এতে আন্তঃকোষীয় ফাঁক থাকতে পারে।</li> <li>• <b>পাতার শিরা এবং পত্রবৃত্ত</b> এদের দেখা যায়। কচি ও নমনীয় কাণ্ড, যেমন কুমড়া ও দগুন্দলের কাণ্ডে এ টিস্যু দৃঢ়তা প্রদান করে।</li> <li>• এ কোষে যখন ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে, তখন এরা খাদ্য প্রস্তুত করে। <b>খাদ্য প্রস্তুত এবং উদ্ভিদদেহকে দৃঢ়তা প্রদান</b> করা এদের প্রধান কাজ।</li> </ul> 



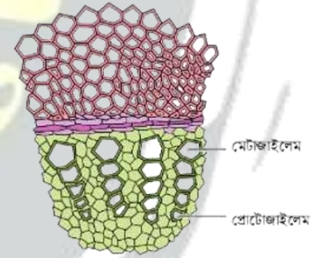
## স্কেলেনকাইমা

- **প্রোটোপ্লাজমবিহীন**, লিগনিনযুক্ত এবং যান্ত্রিক কাজের জন্য নির্দিষ্ট কোষ দিয়ে গঠিত টিস্যুকে স্কেলেনকাইমা টিস্যু বলে।
- প্রাথমিক অবস্থায় কোষগুলোতে প্রোটোপ্লাজম উপস্থিত থাকলেও খুব তাড়াতাড়ি তা নষ্ট হয়ে মৃত কোষে পরিণত হয়।
- এ টিস্যুর কোষগুলো শক্ত, অনেক লম্বা এবং পুরু প্রাচীরবিশিষ্ট হয়।
- কোষগুলো প্রধানত দুই ধরনের, **ফাইবার** এবং **স্কেলরাইড**।
- উদ্ভিদদেহে দৃঢ়তা প্রদান এবং পানি ও খনিজ লবণ পরিবহন করা এর মূল কাজ।
  - **ফাইবার বা তন্তু (Fibre):** এরা অত্যন্ত দীর্ঘ, পুরু প্রাচীরযুক্ত, শক্ত এবং এদের দুই প্রান্ত সরু। তবে কখনো কখনো ভোঁতা হতে পারে। প্রাচীরের গায়ে ছিদ্র থাকে, এ ছিদ্রকে কূপ বলে। অবস্থান এবং গঠনের ভিত্তিতে এদের বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে, যেমন **বাস্ট ফাইবার**, **সার্ফেস ফাইবার**, **জাইলেম তন্তু** বা **কাষ্ঠতন্তু**।
  - **স্কেলরাইড (Sclereids):** এদেরকে **স্টোন সেল**ও বলা হয়। এরা খাটো, সমবাসী, কখনো লম্বাটে আবার কখনো তারাকাকার হতে পারে। এদের গৌণপ্রাচীর খুবই শক্ত, অত্যন্ত পুরু এবং লিগনিনযুক্ত। পরিণত স্কেলরাইড কোষ সাধারণত মৃত থাকে এবং এদের কোষপ্রাচীর কূপযুক্ত হয়। **নল্লবীজী ও দ্বিবীজপত্রী** উদ্ভিদের কটেক্স, ফল ও বীজকে স্কেলরাইড টিস্যু দেখা যায়। বহিঃস্থক জাইলেম এবং ক্লোয়েমের সাথে একত্রে পত্রবুল্বে কোষগুচ্ছরূপে থাকতে পারে।



## জটিল টিস্যু

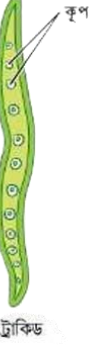
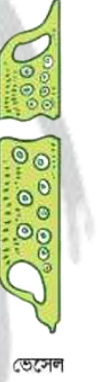


- বিভিন্ন ধরনের কোষের সমন্বয়ে যে স্থায়ী টিস্যু তৈরি হয়, তাকে জটিল টিস্যু বলে।
- এরা উদ্ভিদে পরিবহনের কাজ করে, তাই এদের **পরিবহন টিস্যু**ও বলা হয়।
- এ টিস্যু দুই ধরনের, **জাইলেম** এবং **ক্লোয়েম**।
- জাইলেম এবং ক্লোয়েম একত্রে উদ্ভিদের পরিবহন টিস্যুগুচ্ছ (vascular bundle) গঠন করে।



চিত্র 2.13: একটি পরিবহন টিস্যুগুচ্ছ

## জাইলেম

- জাইলেম দুই ধরনের, **প্রাথমিক ও গৌণ জাইলেম**।
- প্রোক্যাম্বিয়াম থেকে সৃষ্ট জাইলেমকে প্রাথমিক জাইলেম বলে। প্রাথমিক বৃদ্ধি শেষে যেসব ক্ষেত্রে গৌণবৃদ্ধি ঘটে, সেখানে গৌণ জাইলেম সৃষ্টি হয়।
- প্রাথমিক জাইলেম দুই ধরনের। প্রাথমিক অবস্থায় একে **প্রোটোজাইলেম** এবং পরিণত অবস্থায় **মেটাজাইলেম** বলে। মেটাজাইলেমের অভ্যন্তরীণ ফাঁকা গহ্বরটি বড় থাকে।
- জাইলেমে কয়েক ধরনের কোষ থাকে, যেমন: **ট্রাকিড**, **ভেসেল**, **জাইলেম প্যারেনকাইমা** ও **জাইলেম ফাইবার**।

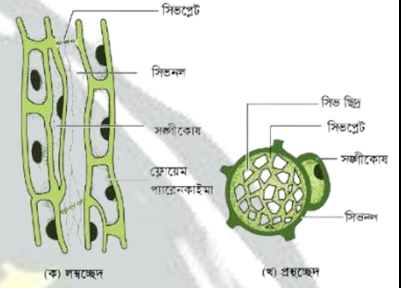
<p><b>ট্র্যাকিড</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ট্র্যাকিড কোষ লম্বা। এর প্রান্তদ্বয় সরু এবং সুচালো।</li> <li>প্রাচীরে লিগনিন জমা হয়ে পুরু হয় এবং অভ্যন্তরীণ গহ্বর বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পানির চলাচল পাশাপাশি জোড়া কূপের মাধ্যমে হয়ে থাকে।</li> <li>প্রাচীরের পুরুত্ব কয়েক ধরনের হয়, যেমন- বলয়াকার, সর্পিলাকার, সোপানাকার, জালিকাকার কিংবা কূপাক্ত।</li> <li>ফার্নবর্গ, নগ্নবীজী ও আবৃতবীজী উদ্ভিদের প্রাথমিক ও গৌণ জাইলেম কলায় ট্র্যাকিড দেখা যায়।</li> <li>কোষরসের পরিবহন এবং অঙ্গকে দৃঢ়তা প্রদান করা এদের প্রধান কাজ। তবে কখনো কখনো খাদ্য সঞ্চয়ের কাজও এই টিস্যু করে থাকে।</li> </ul>	
<p><b>ভেসেল</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ভেসেল কোষগুলো খাটো চোঙের মতো।</li> <li>কোষগুলো একটির মাথায় আরেকটি সজ্জিত হয় এবং প্রান্তীয় প্রাচীরটি গলে গিয়ে একটি দীর্ঘ নলের মতো অঙ্গের সৃষ্টি করে। এর ফলে কোষরসের উপরে ওঠার জন্য একটি সরু পথ সৃষ্টি হয়ে যায়।</li> <li>প্রাথমিক অবস্থায় এ কোষগুলো প্রোটোপ্লাজমপূর্ণ থাকলেও পরিণত বয়সে এরা মৃত এবং প্রোটোপ্লাজমবিহীন হয়।</li> <li>ভেসেলের প্রাচীর ট্র্যাকিডের মতো বিভিন্নরূপে পুরু হয়, যেমন- সোপানাকার, সর্পিলাকার, বলয়াকার, কূপাক্ত ইত্যাদি।</li> <li>এদের প্রধানত গুপ্তবীজী উদ্ভিদের সব অঙ্গে দেখা যায়। নগ্নবীজী উদ্ভিদের মধ্যে উন্নত উদ্ভিদ, যেমন নিটামে (Gnetum) প্রাথমিক পর্যায়ের ভেসেল থাকে।</li> <li>পানি এবং খনিজ লবণ পরিবহন এবং অঙ্গকে দৃঢ়তা প্রদান করা এর প্রধান কাজ।</li> </ul>	
<p><b>জাইলেম প্যারেনকাইমা</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>জাইলেমে অবস্থিত প্যারেনকাইমা কোষকে জাইলেম প্যারেনকাইমা বা উড প্যারেনকাইমা বলে।</li> <li>প্রাইমারি জাইলেমে অবস্থিত প্যারেনকাইমার কোষ পাতলা প্রাচীরযুক্ত। তবে গৌণ জাইলেমে এরা পুরু প্রাচীরযুক্ত হয়ে থাকে।</li> <li>খাদ্য সঞ্চয় এবং পানি পরিবহন করা এদের প্রধান কাজ।</li> </ul>	
<p><b>জাইলেম ফাইবার</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>জাইলেমে অবস্থিত স্ক্লেরেনকাইমা কোষই হচ্ছে জাইলেম ফাইবার।</li> <li>এদের উড ফাইবারও বলে।</li> <li>এ কোষগুলো লম্বা, এদের দুপ্রান্ত সরু।</li> <li>পরিণত কোষে প্রোটোপ্লাজম থাকে না বলে এরা মৃত। উদ্ভিদে এরা যান্ত্রিক শক্তি যোগায়।</li> <li>দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের সব জাইলেমে এরা অবস্থান করে।</li> <li>পানি ও খনিজ পদার্থ পরিবহন, খাদ্য সঞ্চয়, উদ্ভিদকে যান্ত্রিক শক্তি আর দৃঢ়তা প্রদান করা জাইলেম টিস্যুর প্রধান কাজ।</li> </ul>	

## ক্লোয়েম

- উদ্ভিদ কাণ্ডে এরা জাইলেমের সাথে একত্রে পরিবহন টিস্যুগুচ্ছ তৈরি করে।
- সিভনল, সঙ্গীকোষ, ক্লোয়েম প্যারেনকাইমা এবং ক্লোয়েম তন্তু** নিয়ে ক্লোয়েম টিস্যু গঠিত হয়।
- জাইলেম যেমন খাদ্যের কাঁচামাল পানি সরবরাহ করে, তেমনি ক্লোয়েম পাতায় প্রস্তুত খাদ্য উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন স্থানে পরিবহন করে।

## সিভকোষ

- দীর্ঘ, পাতলা কোষপ্রাচীরযুক্ত এবং জীবিত এ কোষগুলো লম্বালম্বিভাবে একটির উপর একটি সজ্জিত হয়ে **সিভনল** (Sieve tube) গঠন করে।
- এ কোষগুলো চালুনির মতো ছিদ্রযুক্ত সিভপ্লেট দিয়ে পরস্পর থেকে আলাদা থাকে।
- সিভকোষে প্রোটোপ্লাজম প্রাচীর ঘেঁষে থাকে বলে একটি কেন্দ্রীয় ফাঁপা জায়গার সৃষ্টি হয়, যেটা **খাদ্য পরিবহনের নল** হিসেবে কাজ করে।
- এদের প্রাচীর লিগনিনযুক্ত।
- পরিণত সিভকোষে কোনো নিউক্লিয়াস থাকে না।**
- সকল ধরনের গুপ্তবীজী উদ্ভিদের ক্লোয়েমে সঙ্গীকোষ এবং সিভনল থাকে।
- পাতায় প্রস্তুত খাদ্য উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন অংশে পরিবহন করা** এদের প্রধান কাজ।



## সঙ্গীকোষ

- প্রতিটি সিভকোষের সাথে একটি করে **প্যারেনকাইমা জাতীয়** কোষ অবস্থান করে।
- এদের কেন্দ্রিকা বা নিউক্লিয়াস বেশ বড়।
- ধারণা করা হয় এই নিউক্লিয়াস সিভকোষের কার্যাবলি কিছু পরিমাণে হলেও নিয়ন্ত্রণ করে।
- এ কোষ প্রোটোপ্লাজম দিয়ে পূর্ণ এবং পাতলা প্রাচীরযুক্ত।
- ফার্ন ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদে এদের উপস্থিতি নেই।**

ক্লোয়েম  
প্যারেনকাইমা

- ক্লোয়েমে উপস্থিত প্যারেনকাইমা কোষগুলোই ক্লোয়েম প্যারেনকাইমা।
- এদের কোষ সাধারণ প্যারেনকাইমার মতো পাতলা কোষপ্রাচীরযুক্ত এবং প্রোটোপ্লাজমযুক্ত।
- এরা **খাদ্য সঞ্চয় করে এবং খাদ্য পরিবহনে** সহায়তা করে।
- ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ, নল্লবীজী উদ্ভিদ এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের ক্লোয়েম টিস্যুতে ক্লোয়েম প্যারেনকাইমা থাকে।
- একবীজপত্রী উদ্ভিদে ক্লোয়েম প্যারেনকাইমা থাকে না।**

ক্লোয়েম  
ফাইবার

- স্কেলেনকাইমা** কোষ সমন্বয়ে ক্লোয়েম ফাইবার তৈরি হয়।
- এগুলো একধরনের দীর্ঘ কোষ, যাদের প্রান্তদেশ পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে।
- এদের বাস্ট ফাইবারও বলে। পাটের আঁশ** এক ধরনের বাস্ট ফাইবার।
- উদ্ভিদ অপ্তের **গৌণবৃদ্ধির সময় এ ফাইবার উৎপন্ন হয়।**
- টিস্যুর মাধ্যমে পাতায় উৎপাদিত শর্করা এবং মূলে সঞ্চিত খাদ্য একই সাথে উপরে নিচে পরিবাহিত হয়।



## প্রাণিটিস্যু

- একই ক্রণীয় কোষ থেকে উৎপন্ন হয়ে এক বা একাধিক ধরনের কিছুসংখ্যক কোষ জীবদেহের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে সমষ্টিগতভাবে একটা কাজে নিয়োজিত থাকলে ঐ কোষগুলো সমষ্টিগতভাবে টিস্যু (Tissue) বা তন্ত্র তৈরি করে।
- একটি টিস্যুর কোষগুলোর উৎপত্তি, কাজ এবং গঠন একই ধরনের হয়। টিস্যু নিয়ে আলোচনাকে **টিস্যুতত্ত্ব (Histology)** বলে।
- কোষ এবং টিস্যুর মধ্যে পার্থক্য খুবই নির্দিষ্ট। কোষ হচ্ছে টিস্যুর গঠনগত ও কার্যকরী একক, যেমন লোহিত রক্তকণিকা, স্বেত রক্তকণিকা এবং অণুচক্রিকা বিভিন্ন ধরনের রক্তকোষ। আবার এরা একত্রে তরল যোজক টিস্যু নামে এক ধরনের টিস্যু হিসেবে পরিচিত। তরল যোজক টিস্যু রক্ত দেহের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শারীরবৃত্তীয় কাজে অংশ নেয়।
- মানবদেহের স্নায়ুকোষ দেহজুড়ে জালের মতো ছড়িয়ে থাকে। *দেহের যেকোনো অংশের উদ্দীপনা গ্রহণ করে মস্তিষ্কে প্রেরণ করা, আবার মস্তিষ্কের কোনো বার্তা শরীরের নির্দিষ্ট অংশে পৌঁছে দেওয়াই এদের কাজ।* চোখের স্নায়ুকোষগুলো দেখতে এবং কানের স্নায়ুকোষগুলো শুনতে সাহায্য করে। মানুষের চোখের মতো বিভিন্ন ধরনের স্নায়ুকোষ না থাকায় বেশিরভাগ প্রাণীই পৃথিবীর দৃশ্যমান বস্তুগুলো রঙিন হিসেবে দেখতে পারে না, অনেক প্রাণী শুধু দিনে বা রাতে দেখতে পায়।
- আমাদের কাজকর্মে, হাঁটা-চলায় এবং নড়াচড়ায় পেশিকোষ ব্যবহৃত হয়।
- তিন ধরনের রক্তকোষ মানব দেহের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত। *লোহিত রক্তকণিকা কোষগুলো ফুসফুসে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং হৃদযন্ত্রের সাহায্যে ধমনির মাধ্যমে কৈশিকনালি হয়ে দেহের প্রতিটি কোষে অক্সিজেন সরবরাহ করে। স্বেত রক্তকণিকা দেহের রোগ প্রতিরোধ করে। রক্তের অণুচক্রিকা কোষগুলো শরীরের কেটে যাওয়া অংশ থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে সাহায্য করে।*
- শরীরের স্বকীয় কোষগুলো দেহের আবরণ দেওয়া ছাড়াও শরীরের অবস্থানভেদে বিভিন্ন কাজ করে থাকে। মাথার স্বকীয় কোষগুলো থেকে চুল গজিয়ে থাকে। শরীরের স্বকের ঘাম নিগমনকারী কোষগুলো নির্দিষ্ট স্থানে ঘাম নিগত করে।
- অস্থিকোষ দেহে অস্থি অথবা কোমলাস্থি তৈরি করে দেহের দৃঢ়তা দিয়ে থাকে। দেহের আকার, গঠন, অস্থির বৃদ্ধি ইত্যাদিতে অস্থিকোষের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

## প্রাণিটিস্যুর প্রকারভেদ

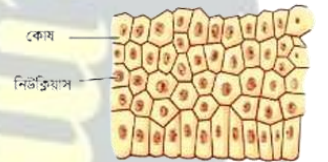
- প্রাণিটিস্যু তার গঠনকারী কোষের সংখ্যা, বৈশিষ্ট্য এবং তাদের নিঃসৃত পদার্থের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রধানত চার ধরনের হয়- **আবরণী টিস্যু, যোজক টিস্যু, পেশি টিস্যু এবং স্নায়ু টিস্যু।**

## আবরণী টিস্যু (Epithelial Tissue)

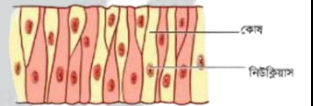
- আবরণী টিস্যুর কোষগুলো ঘন সন্নিবেশিত এবং **একটি ভিত্তিপর্দার উপর বিন্যস্ত** থাকে।
- এই টিস্যু বিভিন্ন অঙ্গের আবরণ (lining) হিসেবে কাজ করে। তবে অঙ্গকে আবৃত রাখাই আবরণী টিস্যুর একমাত্র কাজ নয়।
- এই টিস্যুর কাজ হলো: **অঙ্গকে আবৃত রাখা, সেটিকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা (protection) করা, প্রোটিনসহ বিভিন্ন পদার্থ ক্ষরণ বা নিঃসরণ (secretion) করা, বিভিন্ন পদার্থ শোষণ (absorption) করা এবং কোষীয় স্তর পেরিয়ে সুনির্দিষ্ট পদার্থের পরিবহন (transcellular transport) করা।**

প্রাণিদেহে ভিত্তিপর্দার উপর সজ্জিত কোষগুলোর সংখ্যার ভিত্তিতে এপিথেলিয়াল বা আবরণী টিস্যুকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

সাধারণ আবরণী টিস্যু	<ul style="list-style-type: none"> <li>ভিত্তিপর্দার উপর কোষসমূহ <b>এক স্তরে</b> সজ্জিত।</li> <li>উদাহরণ: <b>বৃক্কের বোম্যান্স ক্যাপসুল, বৃক্কের সংগ্রাহক নালিকা, অন্ত্র প্রাচীর।</b></li> </ul>
স্ট্র্যাটিফাইড আবরণী টিস্যু	<ul style="list-style-type: none"> <li>ভিত্তিপর্দার উপর কোষগুলো <b>একাধিক স্তরে</b> সজ্জিত।</li> <li>উদাহরণ: <b>মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ত্বক।</b></li> <li>এমন স্ট্র্যাটিফাইড আবরণী টিস্যুও আছে, যার স্তরের সংখ্যা মিনিটের মধ্যে পাল্টে যেতে পারে—কখনো দেখা যায় তিন-চারটি স্তর আবার পরক্ষণেই দেখা যায় সাত-আটটি স্তর। তাই একে বলে <b>ট্রানজিশনাল আবরণী।</b></li> <li>যেমন: <b>মূত্রথলি।</b></li> </ul>
সিউডো- স্ট্র্যাটিফাইড আবরণী টিস্যু	<ul style="list-style-type: none"> <li>এই টিস্যুর কোষগুলো ভিত্তিপর্দার উপর এক স্তরে বিন্যস্ত থাকে। তবে কোষগুলো বিভিন্ন উচ্চতার হওয়ায় এই টিস্যুকে দেখতে <b>স্তরীভূত টিস্যু</b> মনে হয়।</li> <li>উদাহরণ <b>ট্রাকিয়া।</b></li> </ul>

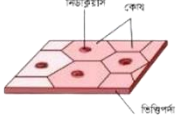
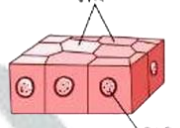
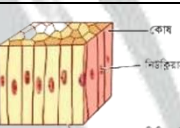


চিত্র 2.19: স্ট্র্যাটিফাইড (স্তরীভূত) বা যৌগিক আবরণী টিস্যু



চিত্র 2.20: সিউডো-স্ট্র্যাটিফাইড এপিথেলিয়াল টিস্যু

কোষের আকৃতি, প্রাণিদেহে তার অবস্থান এবং কাজের প্রকৃতিভেদে সাধারণ আবরণী টিস্যু তিন ধরনের হয়। যেমন:

স্কোয়ামাস আবরণী টিস্যু	<ul style="list-style-type: none"> <li>এই টিস্যুর কোষগুলো মাছের আইশের মতো চ্যাপটা এবং এদের নিউক্লিয়াস বড় আকারের হয়।</li> <li>এই টিস্যু প্রধানত আবরণ ছাড়াও ছাঁকনির কাজ করে থাকে।</li> <li>উদাহরণ: <b>বৃক্কের বোম্যান্স ক্যাপসুল প্রাচীর।</b></li> </ul>	 <p>চিত্র 2.16: স্কোয়ামাস (আইশাকার) আবরণী টিস্যু</p>
কিউবয়ডাল আবরণী টিস্যু	<ul style="list-style-type: none"> <li>এই টিস্যুর কোষগুলো ঘনাকার বা কিউব আকৃতির অর্থাৎ কোষগুলোর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা প্রায় সমান।</li> <li>এই টিস্যু প্রধানত শোষণ ও আবরণ কাজ করে।</li> <li>উদাহরণ: <b>বৃক্কের সংগ্রাহক নালিকা।</b></li> </ul>	 <p>চিত্র 2.17: কিউবয়ডাল (ঘনাকৃতি) আবরণী টিস্যু</p>
কলামনার আবরণী টিস্যু	<ul style="list-style-type: none"> <li>এই টিস্যুর কোষসমূহ স্তম্ভের মতো সরু এবং লম্বা।</li> <li>প্রাধানত ক্ষরণ, রক্ষণ এবং শোষণের কাজ করে থাকে।</li> <li>উদাহরণ: <b>প্রাণীর অন্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরের কোষগুলো।</b></li> </ul>	 <p>চিত্র 2.18: কলামনার (স্তম্ভাকার) এপিথেলিয়াল টিস্যু</p>

আবরণী টিস্যুর কোষগুলো আবার বিভিন্ন কাজের জন্য নানাভাবে রূপান্তরিত হয়। যেমন:

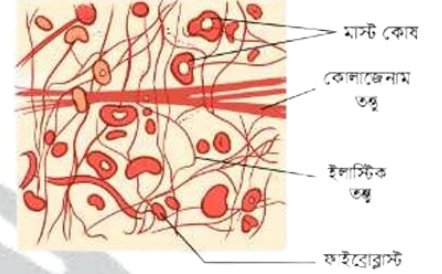
সিলিয়ামযুক্ত আবরণী টিস্যু	<ul style="list-style-type: none"> <li>মেরুদণ্ডী প্রাণীদের <b>খাসনালির প্রাচীরে</b> দেখা যায়।</li> </ul>
ক্লাজেলামযুক্ত আবরণী টিস্যু	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>হাইড্রার এন্ডোডার্মে</b> থাকে।</li> </ul>
ক্ষরণদযুক্ত আবরণী টিস্যু	<ul style="list-style-type: none"> <li>হাইড্রার এন্ডোডার্মে এবং <b>মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অন্ত্রে</b> দেখা যায়।</li> </ul>
জনন অঙ্গের আবরণী টিস্যু	<ul style="list-style-type: none"> <li>বিশেষভাবে রূপান্তরিত আবরণী টিস্যু, যা থেকে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু কোষ উৎপন্ন হয়। এরা প্রজননে অংশগ্রহণ করে প্রজাতির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখে।</li> </ul>
গ্রন্থি আবরণী টিস্যু	<ul style="list-style-type: none"> <li>বিভিন্ন ধরনের <b>রস নিঃসরণ</b> করে।</li> </ul>

আবরণী টিস্যু কোনো অঙ্গের বা নালির ভিতরের ও বাইরের অংশ তৈরি করে থাকে। আবার এই টিস্যু রূপান্তরিত হয়ে রক্ষণ, ক্ষরণ, শোষণ, ব্যাপন, পরিবহণ – এই সব কাজে ভাংশ নেয়। আবরণী টিস্যু রূপান্তরিত হয়ে গ্রন্থি টিস্যু এবং জনন টিস্যুতে পরিণত হয় এবং দেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে।



## যোজক টিস্যু (Connective Tissue)

- যোজক বা কানেকটিভ টিস্যুতে মাতৃকার (Matrix) পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি এবং কোষের সংখ্যা কম।
- গঠন এবং কাজের ভিত্তিতে কানেকটিভ টিস্যু প্রধানত তিন ধরনের হয়।  
যথা-



চিত্র 2.21: কানেকটিভ টিস্যু

<b>ফাইব্রাস যোজক টিস্যু</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• এই ধরনের যোজক টিস্যু <b>দেহস্থকের নিচে পেশির মধ্যে</b> থাকে।</li> <li>• এদের মাতৃকায় বিভিন্ন ধরনের তন্তুর আধিক্য দেখা যায়।</li> </ul>
<b>স্কেলিটাল যোজক টিস্যু</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• দেহের <b>অভ্যন্তরীণ কাঠামো গঠনকারী</b> টিস্যুকে স্কেলিটাল যোজক টিস্যু বলে।</li> <li>• এই টিস্যু দেহের অভ্যন্তরীণ কাঠামো গঠন করে। দেহকে নির্দিষ্ট আকৃতি এবং দৃঢ়তা দেয়। অঙ্গ সঞ্চালন এবং চলনে সহায়তা করে।</li> <li>• মস্তিষ্ক, মেরুরজ্জু, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড-এরকম দেহের নরম ও নাজুক অঙ্গগুলোকে রক্ষা করে। বিভিন্ন ধরনের রক্তকণিকা উৎপাদন করে। ঐচ্ছিক পেশিগুলোর সংযুক্তির ব্যবস্থা করে।</li> <li>• গঠনের ভিত্তিতে স্কেলিটাল যোজক টিস্যু দুধরনের হয়। যেমন: কোমলাস্থি এবং অস্থি। <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>কোমলাস্থি (Cartilage):</b> কোমলাস্থি এক ধরনের নমনীয় স্কেলিটাল যোজক টিস্যু। মানুষের নাক ও কানের পিনা কোমলাস্থি দিয়ে তৈরি।</li> <li>○ <b>অস্থি (bone):</b> অস্থি বিশেষ ধরনের দৃঢ়, ভঙ্গুর এবং অনমনীয় স্কেলিটাল কানেকটিভ টিস্যু। এদের মাতৃকায় ক্যালসিয়াম-জাতীয় পদার্থ জমা হয়ে অস্থির দৃঢ়তা প্রদান করে।</li> </ul> </li> </ul>
<b>তরল যোজক টিস্যু</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• তরল টিস্যুর মাতৃকা তরল। মাতৃকায় বিভিন্ন ধরনের জৈব পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।</li> <li>• এই টিস্যুর প্রধান কাজ দেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন দ্রব্যাদি পরিবহন করা, রোগ প্রতিরোধ করা এবং রক্ত জমাট বাঁধায় বিশেষ ভূমিকা রাখা।</li> <li>• তরল যোজক টিস্যু দুই ধরনের, <b>রক্ত এবং লসিকা।</b></li> <li>• <b>রক্ত</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ রক্ত এক ধরনের ক্ষারীয়, ঈষৎ লবণাক্ত এবং লালবর্ণের তরল যোজক টিস্যু। ধমনি, শিরা ও কৈশিকনালির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রক্ত অভ্যন্তরীণ পরিবহনে অংশ নেয়।</li> <li>○ উষ্ণ রক্তবাহী প্রাণীর দেহে রক্ত তাপমাত্রার ভারসাম্য রক্ষা করে।</li> <li>○ রক্তের উপাদান দুটি— <b>রক্তরস (55%) এবং রক্তকোষ (45%)।</b></li> <li>○ রক্তরস (Plasma) রক্তের তরল অংশ, এর রং ঈষৎ হলুদাভ। এর প্রায় <b>91-92% অংশ পানি এবং 8-9% অংশ জৈব ও অজৈব পদার্থ।</b> এসব রক্তরসের ভিতর বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন এবং বর্জ্য পদার্থ থাকে।</li> </ul> </li> </ul>



চিত্র 2.22: বিভিন্ন ধরনের রক্তকোষ




- রক্তকোষ তিন ধরনের, যথা- লোহিত রক্তকোষ (Erythrocyte বা Red blood cells বা RBC), শ্বেত রক্তকোষ (Leukocyte বা white blood cells বা WBC) এবং অণুচক্রিকা (Thrombocytes বা Blood platelet)।
- লোহিত রক্তকোষ হিমোগ্লোবিন নামে একটি লৌহজাত যৌগ থাকে, যার জন্য রক্ত লাল হয়। হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি অক্সিহিমোগ্লোবিন যৌগ গঠন করে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে অক্সিজেন পরিবহন করে।
- শ্বেত রক্তকোষ জীবাণু ধ্বংস করে দেহের প্রকৃতিগত আত্মরক্ষায় অংশ নেয়। মানবদেহে বেশ কয়েক ধরনের শ্বেত রক্তকোষ থাকে।
- অণুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধায় অংশ নেয়।

#### • লসিকা

- মানবদেহে বিভিন্ন টিস্যুর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানে (Intercellular space) যে জলীয় পদার্থ জমা হয় তাকে লসিকা বলে।
- লসিকা ঈষৎ স্ফারীয় স্বচ্ছ হলুদ বর্ণের তরল পদার্থ।
- এগুলো ছোট নালির মাধ্যমে সংগৃহীত হয়ে একটি আলাদা নালিকাতন্ত্র গঠন করে, যাকে লসিকাতন্ত্র (Lymphatic system) বলে।
- এর মধ্যে কিছু রোগ প্রতিরোধী কোষ থাকে, এদের লসিকাকোষ (Lymphoid cell) বলে।

#### পেশি টিস্যু (Muscular Tissue)

- ভ্রূণের **মেসোডার্ম** থেকে তৈরি সংকোচন ও প্রসারণক্ষম বিশেষ ধরনের টিস্যুকে পেশি টিস্যু বলে।
- **অ্যাকটিন ও মায়োসিন** নামক কিছু **মায়োফাইব্রিলের কারণে** পেশি টিস্যু সংকোচন ও প্রসারণক্ষম হয়।
- এদের **মাতৃকা প্রায় অনুপস্থিত।**
- পেশিকোষগুলো সরু, লম্বা এবং তন্তুময়। যেসব তন্তুতে আড়াআড়ি ডোরাকাটা থাকে, তাদের ডোরাকাটা পেশি (Striated muscle) এবং ডোরাবিহীন তন্তুকে মসৃণ পেশি (Smooth muscle) বলে।
- পেশিকোষ সংকোচন এবং প্রসারণের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালন, চলন ও অভ্যন্তরীণ পরিবহন ঘটায়।
- অবস্থান, গঠন এবং কাজের ভিত্তিতে পেশি টিস্যু **তিন** ধরনের, **ঐচ্ছিক পেশি, অনৈচ্ছিক পেশি এবং হৃৎপেশি।**

<p><b>ঐচ্ছিক পেশি বা ডোরাকাটা পেশি (Striated muscle)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>এই পেশি প্রাণীর <b>ইচ্ছানুযায়ী</b> দ্রুত সংকুচিত এবং প্রসারিত হতে পারে।</li> <li>ঐচ্ছিক পেশি অস্থিতন্ত্রের সংলগ্ন থাকায় একে <b>কঙ্কালপেশিও</b> বলে।</li> <li>ঐচ্ছিক পেশিটিস্যুর কোষগুলো <b>নলাকার, শাখাবিহীন ও আড়াআড়ি ডোরাযুক্ত</b> হয়।</li> <li>এদের সাধারণত একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে।</li> <li>উদাহরণ: মানুষের হাত এবং পায়ের পেশি।</li> </ul>  <p>ঐচ্ছিক পেশি</p>
<p><b>অনৈচ্ছিক পেশি বা মসৃণ পেশি (Smooth muscle)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>এই পেশি টিস্যুর সংকোচন ও প্রসারণ প্রাণীর <b>ইচ্ছাধীন নয়</b>।</li> <li>এ পেশি কোষগুলো <b>মাকু আকৃতির</b>।</li> <li>এদের গায়ে আড়াআড়ি দাগ থাকে না। এজন্য এ পেশিকে <b>মসৃণ পেশি</b> বলে।</li> <li>মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রক্তনালি, পৌষ্টিকনালি ইত্যাদির প্রাচীরে অনৈচ্ছিক পেশি থাকে।</li> <li>অনৈচ্ছিক পেশি প্রধানত দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গাদির সঞ্চালনে অংশ নেয়। যেমন : খাদ্য হজম প্রক্রিয়ায় অন্ত্রের ক্রমসংকোচন।</li> </ul>  <p>অনৈচ্ছিক পেশি</p>
<p><b>কার্ডিয়াক পেশি বা হৃৎপেশি</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>এই পেশি মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হৃৎপিণ্ডের এক বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি।</li> <li>এই টিস্যুর কোষগুলো নলাকৃতি (অনেকটা ঐচ্ছিক পেশির মতো), শাখান্বিত ও আড়াআড়ি দাগযুক্ত।</li> <li>এ টিস্যুর কোষগুলোর মধ্যে <b>ইন্টারক্যালাটেড ডিস্ক</b> (Intercalated disc) থাকে।</li> <li>এদের সংকোচন ও প্রসারণ প্রাণীর ইচ্ছাধীন নয়। অর্থাৎ কার্ডিয়াক পেশির গঠন ঐচ্ছিক পেশির মতো হলেও কাজ অনৈচ্ছিক পেশির মতো। তাই একে <b>ঐচ্ছিক-অনৈচ্ছিক পেশিও</b> বলে।</li> <li>কার্ডিয়াক পেশির কোষগুলো শাখার মাধ্যমে পরস্পর যুক্ত থাকে। হৃৎপিণ্ডের সব কার্ডিয়াক পেশি সমন্বিতভাবে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়।</li> <li>মানব ভ্রূণ সৃষ্টির একটা বিশেষ পর্যায়ে থেকে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত হৃৎপিণ্ডের কার্ডিয়াক পেশি একটা নির্দিষ্ট গতিতে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে দেহের মধ্যে রক্ত চলাচলের প্রক্রিয়া সচল রাখে।</li> </ul>  <p>হৃৎপেশি</p>

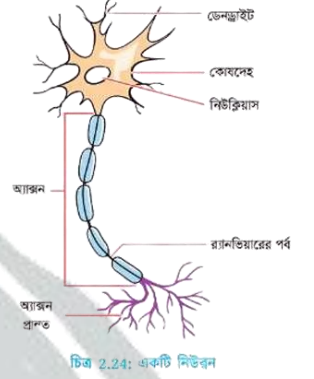


## স্নায়ু টিস্যু (Nerve tissue)

- স্নায়ুটিস্যু উদ্দীপনা গ্রহণ করে মস্তিষ্কে প্রেরণ করে এবং মস্তিষ্ক তাতে সাড়া দেয়। উচ্চতর প্রাণীতে স্নায়ুটিস্যু স্মৃতি সংরক্ষণ (Memorise) করাসহ দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কাজ নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

- স্নায়ু টিস্যু অসংখ্য নিউরন দিয়ে গঠিত।

- দেহের বিশেষ সংবেদী কোষ **নিউরন** বা স্নায়ুকোষগুলো একত্রে স্নায়ু টিস্যু গঠন করে। স্নায়ু টিস্যু পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা, যেমন তাপ, স্পর্শ, চাপ ইত্যাদি গ্রহণ করে দেহের ভিতরে মস্তিষ্কে বহন করে এবং মস্তিষ্কের বিশ্লেষণের পর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপযুক্ত কাজ করে থাকে।



চিত্র 2.24: একটি নিউরন

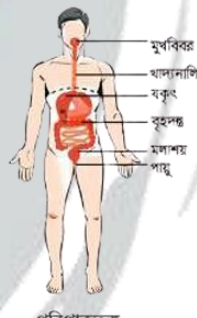
- একটি আদর্শ নিউরনের দুটি অংশ- কোষদেহ এবং প্রলম্বিত অংশ। প্রলম্বিত অংশ আবার দুই ধরনের অ্যাক্সন এবং ডেনড্রাইট।
- কোষদেহের চারদিকের শাখায়ুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রলম্বিত অংশকে ডেনড্রন বলে। ডেনড্রন থেকে যে শাখা বের হয়, তাদের ডেনড্রাইট বলে। ডেনড্রাইটের সংখ্যা এক বা একাধিক হতে পারে। নিউরনের কোষদেহ থেকে একটি লম্বা স্নায়ুতন্তু পরবর্তী নিউরনের ডেনড্রাইটের সাথে যুক্ত থাকে, তাকে অ্যাক্সন বলে। একটি নিউরনের একটি মাত্র অ্যাক্সন থাকে। পরপর দুটি নিউরনে প্রথমটির অ্যাক্সন এবং পরেরটির ডেনড্রাইটের মধ্যে একটি স্নায়ুসন্ধি গঠিত হয়, তাকে **সিন্যাপস** (Synapse) বলে। সিন্যাপসের মধ্য দিয়েই একটি নিউরন থেকে উদ্দীপনা পরবর্তী নিউরনে পরিবাহিত হয়।
- নিউরন কোষ বহুভুজাকৃতি এবং **নিউক্লিয়াসযুক্ত**।
- কোষের সাইটোপ্লাজমে মাইটোকন্ড্রিয়া, গলজিবডি, রাইবোজোম, এডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ইত্যাদি থাকে। তবে নিউরনের সাইটোপ্লাজমে সক্রিয় **সেন্ট্রিওল থাকে না বলে নিউরন বিভাজিত হয় না**।
- অনেকের মধ্যে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, আমরা আমাদের মস্তিষ্কের মাত্র দশ শতাংশ ব্যবহার করতে পারি। ধারণাটি সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ বা অন্য সব প্রাণী তার মস্তিষ্কের একশো শতাংশ ব্যবহার করে থাকে। এটা ঠিক যে, সবসময় একই সাথে মস্তিষ্কের সকল অংশ সমানভাবে সক্রিয় থাকে না। কিন্তু মস্তিষ্কের সবগুলো অংশ কখনো না কখনো আমরা কোনো না কোনোভাবে ব্যবহার করে থাকি। এমনকি এটাও ঠিক নয় যে, একটা নির্দিষ্ট সময়ে মস্তিষ্কের দশ শতাংশের বেশি ব্যবহার করা যায় না। এরকম কোনো সীমা নেই। বিবর্তনগতভাবে এরকম কোনো সীমা আরোপিত হওয়ার কোনো কারণও নেই।

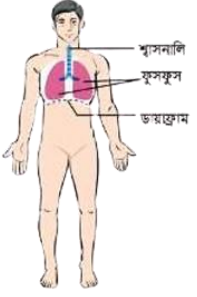


## অঙ্গ ও তন্ত্র

- এক বা একাধিক টিস্যু দিয়ে তৈরি এবং একটা নির্দিষ্ট কাজ করতে সক্ষম প্রাণিদেহের অংশবিশেষকে **অঙ্গ** (Organ) বলে। অর্থাৎ কোনো অঙ্গে একই অথবা একাধিক ধরনের টিস্যু থাকে এবং সেই অঙ্গ কোনো না কোনো নির্দিষ্ট কাজ করতে পারে।
- দেহের অঙ্গসমূহ নিয়ে জীববিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয়, তাকে **অঙ্গসংস্থানবিদ্যা (Morphology)** বলে।



<b>বহিঃঅঙ্গসংস্থান</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• বাহ্যিক অঙ্গসংস্থান সম্বন্ধে জীববিজ্ঞানের যে শাখায় বিশদভাবে আলোচনা করা হয়।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• চোখ, কান, নাক, হাত, পা, মাথা ইত্যাদি বাহ্যিক অঙ্গ।</li> </ul>
<b>অন্তঃঅঙ্গসংস্থান</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• জীবদেহের ভিতরের অঙ্গগুলো সম্বন্ধে জীববিজ্ঞানের যে শাখায় বিশদভাবে আলোচনা করা হয়।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• পাকস্থলী, ডিওডেনাম, ইলিয়াম, মলাশয়, ফুসফুস, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, প্লীহা, ফুসফুস, বৃক্ক, শুক্রাশয়, ডিম্বাশয় ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ অঙ্গ।</li> </ul>

পরিপাক, শ্বসন, রেচন, প্রজনন ইত্যাদি শারীরবৃত্তীয় কাজ করার জন্য প্রাণিদেহে কতগুলো অঙ্গের সমন্বয়ে বিভিন্ন তন্ত্র গঠিত হয়। নিচে মানবদেহের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তন্ত্রের ধারণা দেওয়া হলো।

<b>(a) পরিপাকতন্ত্র</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• এই তন্ত্র খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক, শোষণ এবং অপাচ্য খাদ্যংশ নিষ্কাশনের সাথে জড়িত।</li> <li>• পরিপাকতন্ত্রের দুটি প্রধান অংশ থাকে, যথা: পৌষ্টিক নালি (digestive canal) এবং পৌষ্টিক গ্রন্থি (digestive glands)।</li> <li>• মুখচ্ছিদ্র, মুখগহ্বর, গলবিল, অন্ননালি, পাকস্থলী, ডিওডেনাম, ইলিয়াম, রেকটাম বা মলাশয় এবং পায়ুচ্ছিদ্র নিয়ে পৌষ্টিক নালি গঠিত।</li> <li>• মানুষের লালাগ্রন্থি, যকৃৎ এবং অগ্ন্যাশয় পৌষ্টিক গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে। এসব গ্রন্থির নিঃসৃত রস খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে।</li> </ul>	 <p>পরিপাকতন্ত্র</p>
-------------------------	--	---

(b) শ্বসনতন্ত্র	<ul style="list-style-type: none"> <li>নাসারন্ধ্র, গলবিল, ল্যারিংস, ট্রাকিয়া, ব্রঙ্কাস, ব্রঙ্কিওল, অ্যালভিওলাই এবং একজোড়া ফুসফুস নিয়ে মানুষের শ্বসনতন্ত্র গঠিত।</li> <li>এই তন্ত্র পরিবেশ থেকে গৃহীত অক্সিজেনের সাহায্যে মানুষের দেহের সঞ্চিত খাদ্য থেকে জারণ প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপাদন করে। এ শক্তি দেহের দৈনন্দিন কাজে সহায়তা করে।</li> </ul> 
(c) স্নায়ুতন্ত্র	<ul style="list-style-type: none"> <li>দেহের বাইরের এবং ভিতরের উদ্দীপনা গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা এই তন্ত্রের কাজ।</li> <li>মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড এবং করোটিক স্নায়ু নিয়ে স্নায়ুতন্ত্র গঠিত।</li> <li>এছাড়া স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র নামে স্নায়ুতন্ত্রের আরও একটি অংশ আছে। স্নায়ুতন্ত্রের এই অংশ দেহের অনৈচ্ছিক পেশির কাজগুলো নিয়ন্ত্রণ করে।</li> </ul> 
(d) রেচনতন্ত্র	<ul style="list-style-type: none"> <li>বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় বিপাক ক্রিয়ার ফলে শরীরে উপজাত দ্রব্য হিসেবে নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয়। এসব বর্জ্য পদার্থ সাধারণত দেহের জন্য ক্ষতিকর এবং দেহ থেকে নিষ্কাশনের প্রয়োজন হয়।</li> <li>দেহ থেকে এসব অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন করার পদ্ধতিকে রেচন প্রক্রিয়া বলে।</li> <li>যে তন্ত্রের সাহায্যে রেচন প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাকে রেচনতন্ত্র বলে।</li> <li>একজোড়া বৃক্ক, একজোড়া ইউরেটার, একটি মূত্রথলি এবং একটি মূত্রনালি (ইউরেথ্রা) নিয়ে মানুষের রেচন তন্ত্র গঠিত।</li> </ul> 
(e) জননতন্ত্র	<ul style="list-style-type: none"> <li>প্রজাতির ধারাকে বিলুপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য এই তন্ত্র নিজস্ব বৈশিষ্ট্যযুক্ত নতুন প্রজন্ম সৃষ্টির লক্ষ্যে গ্যামেট (অর্থাৎ শুক্রাণু ও ডিম্বাণু) তৈরি করে।</li> <li>এটি ভ্রূণ ও শিশু ধারক অঙ্গ নিয়ে গঠিত হয়।</li> <li>সাধারণত পরিণত বয়সে জননতন্ত্রের মাধ্যমে প্রাণী প্রজনন ক্ষমতা অর্জন করে। এভাবে প্রজননের মাধ্যমে প্রজাতির ধারা অব্যাহত থাকে।</li> <li>মানুষ একলিঙ্গ প্রাণী। পুরুষ মানুষের দেহে পুরুষ প্রজননতন্ত্র এবং নারীর দেহে স্ত্রী প্রজননতন্ত্র থাকে।</li> </ul>



(f) ত্বকতন্ত্র	<ul style="list-style-type: none"> <li>• দেহের বাইরের দিকে যে আচ্ছাদনকারী আবরণ থাকে, তাকে ত্বক বা চামড়া (skin) বলে।</li> <li>• কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থিযুক্ত এই ত্বক দেহকে আচ্ছাদন করে, বাইরের আঘাত এবং জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।</li> <li>• এছাড়া দেহের জলীয় অংশকে দেহের ভিতর সংরক্ষণ করে।</li> </ul> 
(g) অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র	<ul style="list-style-type: none"> <li>• প্রাণিদেহে কতগুলো নালিহীন বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি আছে। এসব গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসকে হরমোন বলে।</li> <li>• পরিবহন করার জন্য এর কোনো নির্দিষ্ট নালি থাকে না। শুধু রক্তের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে হরমোন পরিবাহিত হয়।</li> <li>• পিটুইটারি, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, অগ্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যানস, সুপ্রারেনাল ইত্যাদি গ্রন্থির সমন্বয়ে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র গঠিত।</li> </ul> 

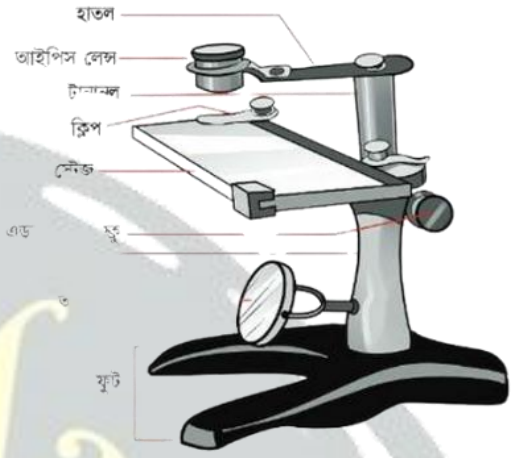
## অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Microscope)

- যে যন্ত্রের সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র কোনো বস্তুকে বহুগুণ বড় করে দেখা যায়, তাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলে।

আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র	<ul style="list-style-type: none"> <li>• যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র আলোর সাহায্যে এসব ক্ষুদ্র বস্তু দেখার ব্যবস্থা আছে। এসব অণুবীক্ষণ যন্ত্রকে আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলে।</li> <li>• আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র দুধরনের, সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র এবং যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র।</li> </ul>
ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র	<ul style="list-style-type: none"> <li>• আলোর বদলে ইলেকট্রন ব্যবহার করা হয় যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে, তাকে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলে।</li> </ul>

## সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র

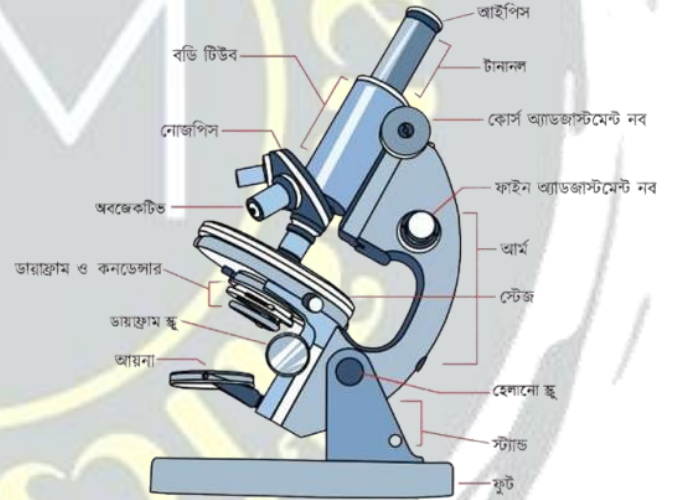
- এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ফুটের উপরে একটি স্তম্ভ থাকে, যার সাথে একটি কাচের স্টেজ সংযুক্ত থাকে।
- এই কাচের স্টেজে দুটো ক্লিপ লাগানো থাকে।
- স্ট্যান্ডের নিচের দিকে সম্মুখভাগে একটি আয়না রয়েছে।
- স্তম্ভের উপরে একটি টানা নল এবং এর বাহতে লেন্স ধরে রাখার জন্য আংটা থাকে।
- এই আংটায় লেন্স বসিয়ে এডজাস্টমেন্ট স্ক্রু ঘুরিয়ে দ্রষ্টব্য বস্তুর উপর ফোকাস করা যায়। আয়না দিয়ে দ্রষ্টব্য বস্তুতে আলো প্রতিফলিত করে পরীক্ষার কাজ শুরু করতে হবে।
- যে ভিত্তির উপর যন্ত্রটি দাঁড়িয়ে, সেটিকে ফুট বলে।



চিত্র 2.26: একটি সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র

## মৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র

- **স্ট্যান্ড:** এটি বেজ-এর উপর দণ্ডায়মান একটি উল্লম্ব পিলার।
- **আর্ম:** স্ট্যান্ড-এর উপরের দিকে বাঁকানো অংশকে আর্ম বলে।
- **ফুট:** স্ট্যান্ড-এর নিচের দিকে পাটাতনের মতো অংশটির নাম বেজ বা ফুট।
- **স্টেজ:** আর্ম-এর নিচের অংশে স্টেজ লাগানো থাকে।
- **বডি টিউব:** অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উপরের দিককার একটি নলাকার অংশ যার একপ্রান্তে আইপিস এবং অপর প্রান্তে অবজেকটিভ লেন্সগুলো লাগানো থাকে।
- **নোজপিস ও অবজেকটিভ:** বডি টিউবের নিচের দিকের ঘূর্ণনশীল অংশটিকে নোজপিস বলে। এতে তিনটি অবজেকটিভ (লেন্স) লাগানো থাকে, যথা- লো পাওয়ার অবজেকটিভ (10x-12x), হাই পাওয়ার অবজেকটিভ (40x-45x), অয়েল ইমারশন অবজেকটিভ (100x)। কোনো কোনো যন্ত্রে অবশ্য আরও একটি অবজেকটিভ থাকে,



চিত্র 2.27: মৌগিক আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ

যাকে বলে স্কিনিং অবজেকটিভ (4x-5x)। এখানে x এর সাথে উল্লিখিত সংখ্যাগুলো নির্দেশ করছে যে, উক্ত লেন্স বা লেন্স সমবায় দ্বারা কতগুণ বিবর্ধন ঘটে।

- **আইপিস:** বড়ি টিউবের উপরের অংশে একটি (monocular) বা দুটি (binocular) আইপিস (লেন্স) লাগানো থাকে। এর বিবর্ধন ক্ষমতা সাধারণত 10x-12x হয়।
- **ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট নব:** এটি একটি ছোট নব। এটিকে ঘুরিয়ে স্টেজকে ওঠা-নামা করানোর মাধ্যমে স্লাইডকে লেন্সের ফোকাস দূরত্বের (focal length) ভিতরে বা বাইরে নেওয়া যায়। এটিকে অনেকখানি ঘোরালে স্টেজের অল্প একটু সরণ ঘটে অর্থাৎ এটি দিয়ে ফোকাসের সূক্ষ্ম সমন্বয় করা হয়।
- **কোর্স অ্যাডজাস্টমেন্ট নব:** এটি একটি বড় নব। এটিকে ঘুরিয়ে স্টেজকে ওঠা-নামা করানোর মাধ্যমে স্লাইডকে লেন্সের ফোকাস দূরত্বের ভিতরে বা বাইরে নেওয়া যায়। এটিকে অল্প ঘোরালেই স্টেজের অনেকখানি সরণ ঘটে অর্থাৎ এটি দিয়ে ফোকাসের স্থূল সমন্বয় করা হয়।
- **সাবস্টেজ ডায়াফ্রাম ও কনডেন্সার:** স্টেজের নিচে সাবস্টেজ অবস্থিত যেটা উঠা-নামা করানো যায় এবং এর সাথে একটি কনডেন্সার লাগানো থাকে। কনডেন্সারের মধ্যে একটি ডায়াফ্রাম বা পর্দা থাকে, যেটা কতটুকু আলো কনডেন্সারের ভিতরে প্রবেশ করবে তা নির্ধারণ করে।
- **আলোর উৎস:** বেজ-এর কেন্দ্রে একটি আলোর উৎস (যেমন: আয়না বা বৈদ্যুতিক বাতি) থাকে, যেখান থেকে আলো কনডেন্সারের মধ্য দিয়ে লেন্সে প্রবেশ করে।

### মৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার

- অণুবীক্ষণ যন্ত্রে প্রাকৃতিক আলো ব্যবহার করতে চাইলে গবেষণাগারের আলোকিত স্থানে এটি স্থাপন করতে হবে।
- প্রথমেই আয়নাটি এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি মঞ্চটির ছিদ্র বরাবর বসানো কাচের স্লাইডের নিচে প্রতিফলিত হয়। আর যদি কৃত্রিম আলোক উৎস অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অংশ হিসেবে উপস্থিত থাকে, তাহলে শুধু সেটি জ্বালালেই চলবে।
- যে স্লাইডটি পর্যবেক্ষণ করা হবে তা মঞ্চের ক্লিপের সাহায্যে এঁটে দিতে হবে। এরপর নোজপিস ঘুরিয়ে নিয়ে অবজেকটিভের কম পাওয়ারের লেন্স স্লাইড বরাবর স্থাপন করতে হবে।
- এবার প্রথমে কোর্স অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু এবং পরে ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু ঘুরিয়ে দেখার বস্তুটি ফোকাসে আনতে হবে।
- এবার বড়ি টিউবে স্থাপিত আইপিস লেন্সে চোখ রেখে দেখতে হবে। প্রয়োজনে ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু ঘুরিয়ে নেওয়া যাবে। মনোকুলার হোক বা বাইনোকুলার, অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখার সময় দুটি চোখই খোলা রাখার চেষ্টা করতে হবে।



## স্টেইনিং

- কোষ বা টিস্যুর পাতলা স্তরকে যখন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা হয়, তখন সেটি যে জলীয় মাধ্যমে অবস্থান করে, তার থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করা মুশকিল। এ সমস্যা সমাধান করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে।
- তার মধ্যে একটি উপায় হলো ওই কোষ বা টিস্যুকে রং করা, যাতে সেই রং দেখে পারিপার্শ্বিকতার সাপেক্ষে তার অবস্থান এবং আকৃতি আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়। অনেক সময় এই রঞ্জন প্রক্রিয়া এত সূক্ষ্মতার সাথে করা সম্ভব, যাতে করে শুধু বিশেষ ধরনের কোষ কিংবা কোষের বিশেষ কোনো অংশ বা অঙ্গাণু অথবা টিস্যুর নির্দিষ্ট কোনো উপাদানই কেবল রঙিন হয়। একেই বলে স্লাইড স্টেইনিং।
- যেসব রঞ্জক পদার্থ দিয়ে স্টেইনিং করা হয়, সেগুলোকে একত্রে স্টেইন (stain) বলে।

- বিবর্ধনের জন্য ব্যবহৃত তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত কম হবে, তত ছোট বস্তুকে বিবর্ধিত করা সম্ভব হবে। সাধারণত বিবর্ধনে ব্যবহৃত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের প্রায় তার্কিকের চেয়ে ছোট বস্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখার মতো করে ফোকাস করা সম্ভব নয়।
- দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 400 - 700 ন্যানোমিটারের মধ্যে থাকে। তাই সবচেয়ে উন্নতমানের আলোক অণুবীক্ষণেও 200 ন্যানোমিটারের থেকে ছোট বস্তুকে বিবর্ধিত করে দেখা যায় না, এমনকি অনেক শক্তিশালী বহুসংখ্যক লেন্সের সমন্বয় করেও সেটি করা যায় না।
- ফলে আলোক অণুবীক্ষণে কোষের কোষঝিল্লি, নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম ছাড়া আর কিছু খুব একটা ভালো করে বোঝা যায় না। সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত অঙ্গাণুগুলোকে আলাদা করে দেখা যায় না।
- এ সমস্যা সমাধানের জন্য দৃশ্যমান আলোর পরিবর্তে ইলেক্ট্রন তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়, কেননা ইলেক্ট্রনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলোর চেয়ে অনেক ছোট করা সম্ভব। কাচের লেন্সের পরিবর্তে সেখানে ব্যবহৃত হয় শক্তিশালী তড়িৎ চুম্বক, যা ইলেক্ট্রন স্রোতের গতিপথ বাঁকিয়ে দিতে পারে, ঠিক যেরকম কাচ, আলোকে বাঁকিয়ে দেয়।
- ফলে কোষের ভিতরকার অঙ্গাণুগুলো স্পষ্ট দেখা সম্ভব হয়। যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ইলেক্ট্রন তরঙ্গকে ব্যবহার করে বিবর্ধন করা হয়, তাকে ইলেক্ট্রন (ইলেক্ট্রনিক নয়) মাইক্রোস্কোপ (electron microscope) বা ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলে।
- ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাথে সংযুক্ত একটি কম্পিউটার ঐ অদৃশ্য ছবিকে আমাদের দেখার উপযোগী ছবিতে পরিণত করে যা, কম্পিউটারের মনিটরে দৃশ্যমান হয়।

ইলেক্ট্রন  
অণুবীক্ষণ যন্ত্র